‘এ কি গো বিস্ময়’

সুমনা চৌধুরী

এই জগৎ-জীবন, এই পারিপার্শ্বিক মানুষজন সবই এক বিস্ময়! জীবনের পথে যতই এগিয়ে চলি ততই যেন এক এক করে পর্দা সরে যায়। বিস্মিত করে, আনন্দ দেয়। এই আনন্দকে সযতনে হৃদয়ে ধরে অবলীলায় তাতে অবগাহন করে সময়ের স্রোতে ভেসে যাওয়া—এ বুঝি মানবজীবনেই সম্ভব! তাই প্রকৃতির অসীম ভাণ্ডারে লুকোনো বিস্ময় যখন চোখের সামনে ধরা দেয় তখনই প্রাণে বেজে ওঠে—

“মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে,
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে...।”

কিন্তু একাকী নয়। পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্যের কাছাকাছি ভ্রমণে আমরা এবার চারজন। আমরা দুজন সিনিয়র সিটিজেন। আর আমার কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্র।

তৃতীয়বারের এই আমেরিকা গমনের মূল উদ্দেশ্য এবার ছিল—কনিষ্ঠা কন্যা কৃষ্ণকলির গবেষণার সমাপ্তিতে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে হাজির হওয়া। Purdue University এবার একশো পঞ্চাশতম বর্ষে পদার্পণ করেছে। তাই উদ্যোগও বিশিষ্ট। আমরাও তাই সমাবর্তনে উপস্থিত হয়ে বহুকাঙ্ক্ষিত অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। অগণিত বুধমণ্ডলীর সমাবেশ, সুশৃঙ্খল অনুষ্ঠান এবং সুপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য সবই আমাদের সঞ্চয় হয়ে রইল। পরদিনই গন্তব্য কন্যার নব কর্মস্থল হিলসবরো (পোর্টল্যান্ড)—আমেরিকার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ওরেগন রাজ্যের অন্তর্গত। ছোট্ট সুন্দর সাজানো শহর হিলসবরোই আমাদের মাস দেড়েকের আবাসস্থল। সময় সংক্ষিপ্ত, তাছাড়া ঝুলনের পাঁচদিন অফিস। তাই প্রতি সপ্তাহান্তেই কাছে দূরে নানা জায়গায় বেড়ানোর পরিকল্পনা আগে থেকেই করে রেখেছে সে। এরই মধ্যে ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯, এখানে ‘লেবার ডে’-এর ছুটি থাকায় সপ্তাহান্তে আমরা পাড়ি দিলাম পৃথিবীর সাতটি প্রাকৃতিক আশ্চর্যের অন্যতম গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ন্যাশনাল পার্ক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে।

এই পরিকল্পনা শুনে সুদূর ক্যালিফোর্নিয়াবাসী আমার ভ্রাতুষ্পুত্র অভীকও উৎসাহিত হয়ে আমাদের সঙ্গী হতে চায়। ব্যস, মজা দ্বিগুণ। মাঝপথে সে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে এমনই ঠিক হল।

৩০ আগস্ট ২০১৯ রাত ৯টায় উড়ান ধরার জন্য আমরা রওনা হলাম পোর্টল্যান্ড বিমানবন্দরে, যা আমাদের বাড়ি থেকে গাড়িতে কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের দূরত্বে। যথাসময়ে বিমান ছেড়ে ফিনিক্সের বিমানবন্দরে অবতরণ করল রাত্রি ১১-৩০ মিনিটে। অভীকও এখানে একটু আগেই পৌঁছেছে। এয়ারপোর্টের বাইরেই আমাদের তিনদিনের সফরসঙ্গী গাড়িটি অপেক্ষারত। চাবিও খোলা। অনলাইনে বুক করা ছিল। কোনও পাহারাদার নেই। আশ্চর্য লাগে!

হোটেলে পৌঁছতে প্রায় রাত দুটো। কিন্তু অভীকের আজ জন্মদিন। সেটা তো অবহেলা করা যায় না! সঙ্গে আনা কেক কাটা হল। মিষ্টিমুখও করা হল। হলই বা রাত দুটো। বাড়ির লোকের সঙ্গে দূর প্রবাসে জন্মদিন পালন তো দুর্লভ ব্যাপার। তাই আনন্দে সব ক্লান্তি দূর। রাত আর বেশি বাকি নেই। পরদিন ভোর-ভোর বেরোনোর জন্য প্রস্তুতি শুরু। হোটেলের নিচেই কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা থাকায় খুব সুবিধা হল। আমরা দুর্গা বলে রওনা দিলাম। আবহাওয়া খুব মনোরম। আকাশও পরিষ্কার। সুশৃঙ্খল যানবাহন চলেছে মসৃণ রাস্তায়। গাড়ির গতির সঙ্গে আমাদের মনও উড়ে চলেছে। ক্রমশ শহরের ভিড় ছাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা এলাকায় প্রবেশ করেই রাস্তার নাম 'ক্যাকটাস ওয়ে' দেখে একটু অবাক হলাম। একটু পরেই আসল রহস্য বোঝা গেল। দুপাশে অসমতল ভূমি। টিলার মতো ছোট বড় পাহাড়। আর তাতে অসংখ্য ক্যাকটাস। তিনটি প্রজাতির ক্যাকটাসই চোখে পড়ল। যেটা সবচেয়ে বেশি হয়েছে সেটা বড় বড় কাঁটাযুক্ত এবং মুগুরের আকৃতি। কত যে বড় তা না দেখলে ধারণা করা যাবে না। আর একটা ফণিমনসার মতো, আর একটা ছোট ছোট ঝোপের মতো। সেগুলোতে আবার ছোট ছোট সাদা, হলুদ, লাল ফুল ও ফল ধরেছে। মাইলের পর মাইল এত কাঁটাগাছ—সেটাও রহস্যময়।

গাড়ি চলেছে। চালক কন্যা স্বয়ং, আমি পিছনে বসে পথের শোভা দেখছি। মন হারিয়ে গেল অতীতে। বিদ্যালয়জীবনে ভূগোলের ক্লাসগুলো ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়—শিক্ষিকার গুণে। তিনি ক্লাস নাইনে 'নদীর উচ্চগতির কাজ' শীর্ষক পাঠে এই কলোরাডো নদীর গিরিখাত এত সুন্দর করে বুঝিয়েছিলেন যে তখনই মনে মনে তার চিত্রকল্প আঁকা হয়ে গিয়েছিল। সেই কল্পনার গ্র্যান্ড ক্যানিয়নকে যে কখনও চাক্ষুষ করতে পারব তা স্বপ্নেও ভাবিনি। তবু অনেক অধরার মধ্যে কখনও হাতের মধ্যে এসে ধরা দেয় অচিন্তনীয় প্রাপ্তি! কখন কেমন করে তা কেউ বলতে পারে না।

ধীরে ধীরে ক্যাকটাসের মরুভূমির মতো এলাকা ছাড়িয়ে আমরা আরও দূরে চলেছি। দূরের পাহাড় কাছে আসে। ভূমির প্রকৃতি দেখে অনুমান করা যায় আমরা গন্তব্যের কাছাকাছি এসে পড়েছি। Tusyan-এ পৌঁছে আমরা প্রথমেই মধ্যাহ্ন আহার সমাধা করলাম এবং পরিকল্পনা মাফিক সুন্দরভাবে ঘোরার বিষয়টাও ঠিক করলাম। এই যে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন, সুবিশাল যার ব্যাপ্তি, তার সম্পূর্ণটা ঘুরে দেখা প্রায় অসম্ভব। অন্তত সাতদিন সময় চাই। এর নর্থ ও সাউথ রিমটাই দ্রষ্টব্য। তাই আমরা কম সময়ে সবচেয়ে বেশি অংশ দেখব বলে সাউথ রিমটাই তালিকায় রাখলাম। এই তিনদিনের ভ্রমণে এবার একটা অভিনব মাত্রা যোগ হল অভীক-

ক্যাকটাসের মরুভূমি

ঝুলনের যৌথ প্রচেষ্টায়, সেটি হল হেলিকপ্টার রাইড—এতে আমাদের আকাশ থেকে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের সামগ্রিক রূপটি দেখা সম্ভব হবে। আর প্রথম হেলিকপ্টারে চড়ার অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় হবে। তাই ওরা আগে থেকেই প্যাপিলিয়ন হেলিকপ্টার কোম্পানির টিকিট বুক করে রেখেছে। দুপুর আড়াইটেয় আমাদের রাইড পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্য। গাড়ি পার্ক করে আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন ওড়াউড়ি শুরু হয়েছে কপ্টারের। কী সুন্দর দেখতে ছোট ছোট কপ্টারগুলো! ছজন করে নিয়ে উড়ছে। তার আগে ভাল করে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে চেক করা হল। নিরাপত্তার যথেষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। তবে শাড়ি পরিহিতা আমাকে দেখে অনেকেরই চোখে বিস্ময়। আমার অবশ্য কনফিডেন্সের কোনও অভাব ছিল না। আমাদের সঙ্গে এক আমেরিকান দম্পতিও উঠলেন কপ্টারে। ঝুলন বসল পাইলটের পাশে। দৈহিক ওজন অনুযায়ী বসার জায়গা ঠিক হয়। তাই সবচেয়ে হালকা ব্যক্তিই সামনে বসার সুযোগ পেল। আমরাও সহজেই উঠে পড়লাম। প্রথম মাটি ছাড়ার সময় একটু ঝাঁকুনি লাগে আর প্রপেলারের আওয়াজও বেশি। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের এই আকাশ ভ্রমণ এবং বার্ডস আই ভিউ এককথায় অনবদ্য। পাইলটের ধারাবিবরণীও বেশ পরিষ্কার। মাঝে মাঝে ঝুলন তর্জমা করে দিয়েছে (উচ্চারণ বেশ অন্যরকম কখনও)। উপর থেকে দেখার অভিজ্ঞতা খুবই সুন্দর। কোথাও একেবারে রুক্ষ পাহাড়, লাল পাথুরে জমি। কোথাও বা কিছু গাছপালা দিয়ে সাজানো সৃষ্টিকর্তার আপন খেয়ালে। নদীর জলের শক্তি ও তার দ্বারা সৃষ্ট প্রাকৃতিক কারুকার্য দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছি আমরা।

কলোরাডো আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিমের সুবিখ্যাত নদী। ১৪৫০ মাইল দীর্ঘ। সাতটি রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। উচ্চগতিতে সে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে চলেছে যার ফলে সবচেয়ে গভীর গিরিখাত সৃষ্টি হয়েছে যা গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন নামে পৃথিবীবিখ্যাত। পৃথিবীর সাতটি প্রাকৃতিক আশ্চর্যের অন্যতম। এই গিরিখাতটির বিষয়ে ইতিহাস কী বলে তা একটু জেনে নেওয়া যাক।

উত্তর অ্যারিজোনা প্রদেশে নেভাদা ও ইউটার সীমায় এই খাতটি আছে। এর গভীরতা এক মাইলের বেশি। পাঁচ-ছয় লক্ষ বছর আগে এটি সৃষ্ট হয়েছে, এমনই অনুমান করা হয়। কিন্তু এটি আবিষ্কৃত হয় সাড়ে দশ হাজার বছর আগে। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে তেরো জন স্পেনীয় সৈনিক সেখানে প্রথম পৌঁছেছিলেন। কিন্তু এর থেকে বেশি কিছু অগ্রগতি হয়নি। পরে ১৮৫৮ সালে প্রথম ভূবিজ্ঞানী John Strong Newberry এখানে পৌঁছন এবং ১৮৬৯-এ Major John. W. Powell এখানে প্রথম অভিযান চালান। তারপর ধীরে ধীরে তা মানুষের দ্রষ্টব্য হয়ে দাঁড়ায়। তামার রঙের কলোরাডো নদী, তার শক্তিতে কারও সাহায্য ছাড়াই এত সুন্দর পাথরের কারুকার্য সৃষ্টি করেছে। বহু বছরে তা একটুও নষ্ট হয়নি। আকাশপথে ঘুরতে ঘুরতে বিস্ময়াভিভূত মন কেবলই একথা ভাবছিল, আর কখন যে নির্ধারিত সময় কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। হেলিকপ্টার মাটি ছুঁয়ে ফেলার পরও অতৃপ্তি থেকে গেল। আবার অন্যভাবে এই বিস্ময়কে স্পর্শ করার অভিজ্ঞতা পরদিন হবে এই চিন্তা করে আমরা বিশ্রামের জন্য হোটেলে চলে গেলাম। হোটেলটির নামও বিস্ময়করভাবে ‘The Grand Hotel’। পরদিন সকালে আমাদের দ্রষ্টব্য গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ন্যাশনাল পার্ক।

যেহেতু সময়টা এদেশের বসন্ত ও গ্রীষ্মের মাঝামাঝি, তাই ভ্রমণার্থীর সংখ্যাও বেশি। এদেশের পর্যটকের সঙ্গে অন্যদেশের পর্যটকও প্রচুর। তার সঙ্গে বেশ কিছু ভারতীয় তথা বাঙালি পরিবারেরও

দেখা মিলল। আমার শাড়ি দেখে অনেকেই 'Are you Indian' বা 'Are you from Kolkata' বলে পরিচয় করলেন। সুবিশাল পার্কিং এরিয়াতে গাড়ি রেখে আমরা বাসস্টপে এলাম। আমাদের এই বাসেই আজকের ভ্রমণ। কিন্তু যেকোনও একটা বাসে নয়। প্রচুর বাস আছে। যখন যে-বাসটি পাওয়া যাবে, তাইতেই চড়া যাবে। একদল বাস যাচ্ছে। একদল আসছে ভ্রমণার্থীদের নিয়ে। প্রতিটি বাস বারোটি ভিউ পয়েন্ট ঘুরিয়ে আনছে। আমরাও সেভাবেই প্রায় সবগুলি ভিউ পয়েন্টে নামলাম এবং মন ভরে এই প্রাকৃতিক আশ্চর্যকে উপভোগ করলাম। বলা ভাল পর্যবেক্ষণ করলাম। এত বিশাল এই দক্ষিণাংশ যে তাকে কয়েকটি ভিউ পয়েন্ট থেকে না দেখলে সম্পূর্ণত দেখা সম্ভব নয়। প্রতিটি ভিউ পয়েন্ট থেকে তার ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি এবং গঠনশৈলী দেখা যাচ্ছে যা এককথায় অভূতপূর্ব। ভিউ পয়েন্টগুলো রেলিং দিয়ে ঘেরা। নিচে অতল খাদ। সেখানে নদীপ্রবাহ দৃষ্টিগোচর হয় কোথাও কোথাও। প্রতিটি বাঁকে গিরিখাতটির ভাস্কর্য অবিস্মরণীয়। অতি সুন্দর এই প্রাকৃতিক কারুশৈলী। মনে হয় যেন কোনও সুদক্ষ ভাস্কর ছেনি-হাতুড়ির সাহায্যে পাহাড় কেটে স্থাপত্য নির্মাণ করেছে। কোথাও মন্দিরের আদল। কোথাও বা বৌদ্ধগুহা বা বিহারের মতো দেখাচ্ছে। ইলোরার গুহামন্দিরের সঙ্গে আমি যেন কোথাও সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম। একটা জায়গায় বেশ অনেকটা ঢালু মতো। মনে হয় নিচে নামার রাস্তা। কেউ বোধহয় বাস করে। এ-প্রসঙ্গে জানা গেল গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের অববাহিকার নিচে নামা যায় এবং সেখানে তাঁবুতে বা ক্যাম্পে থাকাও যায়। কেউ কেউ দল বেঁধে এসে সেই অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ নেয়। অবশ্যই কমবয়সিরা। শুধু একটি নদীর জলের প্রবল গতিশক্তিতে এতবড় প্রাকৃতিক ভাস্কর্য সৃষ্টি হয়েছে এবং তা লক্ষাধিক বছরেও নষ্ট হয়নি,

আমাদের বাস

একথা ভেবেই বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি।

আস্তে আস্তে দিন শেষ হয়ে আসছে। আমরা শেষ ভিউ পয়েন্টে এলাম। এখান থেকে দুদিকের ক্যানিয়নই দেখা যায়। আসার সময় পাশের জঙ্গলে বেশ বড় বড় হরিণ চরে বেড়াচ্ছে দেখা গেল। এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশে বন্য প্রাণীরা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। দক্ষিণ ভাগের শেষাংশে দাঁড়িয়ে বিস্তৃত ক্যানিয়নের দুটি রূপ চাক্ষুষ করলাম। একদিকে রুক্ষ পাহাড়, অন্য পাশে সবুজ বনানী। সুবিশাল নেভাদা পর্বতরাজির মাঝখানে যতদূর দৃষ্টি যায় সুগভীর খাত, মাথার উপর নির্মল আকাশে সূর্যের শেষ রশ্মির আলপনা। আমরা আর দেরি না করে কয়েকটি জলের বোতল সংগ্রহ করে সানসেট পয়েন্টের দিকে এগোলাম।

সে অতি অপূর্ব দৃশ্য। সূর্যের অস্তরাগে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের সুদীর্ঘ ভাস্কর্যের রূপ দেখে অজান্তেই 'ডি লা গ্র্যান্ডি'—বলে ওঠা। আর কীভাবেই বা প্রকাশ করতে পারি আমার বিস্ময়! ক্যানিয়নের খাঁজে খাঁজে শেষ সূর্যরশ্মির নির্বাধ বিচ্ছুরণের এক মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সব ভ্রমণার্থীরাই নিশ্চুপে সেই সৌন্দর্য উপভোগ করছেন। কারও মুখে কথা সরছে না। এই ক্ষণিকের রূপকে তো কথায় বাঁধা যায় না! আমিও একটা পাথরের উপর চুপ করে বসে প্রকৃতির অনাবিল রূপ, আকাশের

রঙের খেলা এবং রূপান্তর দেখতে লাগলাম। পাহাড়ের পিছনে সূর্যদেব ধীরে ধীরে অস্ত গেলেন। আঁধার নামছে—একটা পাথরের পাশে লেখা রয়েছে—

“Sing to God. Sing praises to His name
Lift up a song to Him,
Who rides upon the clouds.
His name is the Lord.
Exult before Him.”

মহান প্রকৃতির কাছে নতজানু হলাম দিনের শেষে।

ফিরতি বাস এসে গেল। আমরা প্রথম বাসটিতে জায়গা পেলাম না। ভালই হল, অন্ধকারের আবছায়ার মাঝে পৃথিবীর আশ্চর্য কীর্তিকে অনুভব করলাম কিছুক্ষণ। মিনিট দশ পরেই আমাদের বাস এল এবং নির্দিষ্ট পথে ফিরে চলল। জানালা দিয়ে বারবার ফিরে দেখছি কলোরাডো নদীর এই বিশ্বখ্যাত সৃষ্টি। আমার মন বাঁধা পড়ে গেছে বহুদিনের স্বপ্ন পূরণের সেই মায়াময় রাজ্যে।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের সুদীর্ঘ ভাস্কর্য

ইতিমধ্যে ঝুলন ও অভীক ঠিক করল রাতের খাবার খেয়েই আমরা হোটেলে ফিরব। বাস থেকে নেমে কাছেই একটি রেস্তোঁরায় গেলাম। খুব সুন্দর সেল্‌ফ সার্ভিস। আমরাও অর্ডার দিয়ে সমস্ত খাবার নিয়ে এসে বসে ধীরে ধীরে খাওয়া শেষ করলাম। বেশি কথা হচ্ছে না কারণ মনে সেই ভাললাগার ও বিস্ময়ের রেশ রয়ে গেছে। রাত বাড়ছে। বেরিয়ে আবার বাস ধরে পার্কিং প্লেসে যেতে হবে। তারপর বিশ্রাম। কিন্তু বিস্ময়ের শেষ যে তখনও হয়নি তা বেরিয়ে বোঝা গেল। খোলা জায়গায় বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছি। চারদিক শুনশান। আমাদেরই মতো দু-চার জন অপেক্ষারত। পাশের বাঁধানো বেদিটার উপর বসে যেই উপর দিকে তাকিয়েছি, আহা! আবার বিমুগ্ধ। মাথার ওপর হাজার চুমকি বসানো নিকষ কালো ওড়নাখানি বিছিয়ে রয়েছে। এত পরিষ্কার রাতের আকাশ কখনও চোখে পড়েনি। বিস্তৃত গগনে এক এক করে কালপুরুষ, লুব্ধক, সপ্তর্ষিমণ্ডল, লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল, ক্যাসিওপিয়া, ধ্রুবতারা সবই নজরে এল। মাঝখান দিয়ে আকাশজোড়া ছায়াপথ। Galaxy বা Milky way ঝকঝক করছে। তাকিয়েই আছি। ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল, তবু—‘‘মধুর তোমার শেষ যে না পাই, প্রহর হলো শেষ।”

হঠাৎ বাসের হর্ন। ছুটে গিয়ে চড়ে বসলাম। পার্কিং এরিয়াতে গিয়ে ওরা দু-ভাইবোনে যাচ্ছে গাড়ি আনতে, ওদের পিছনে আমরা যাচ্ছি। জায়গাটা একটু আলো আঁধারি, তাই মোবাইলে টর্চ জ্বেলে চলছি। হঠাৎ চমকে পিছু হটে এলাম! জ্বলজ্বলে দুটো চোখ কোনও প্রাণীর! ভাল করে তাকিয়ে দেখি বিরাট বড় একটা হরিণ (এখানে বলে Elk)। রাস্তার পাশে পাইপে জল যাচ্ছে, সেই জল খেতে এসেছে। রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছে। টর্চের আলোতে এরই চোখ জ্বলছিল। পাহাড়ি পথে বাস থেকে যাদের দেখা পেয়েছিলাম দূরে, তাদেরই একজনকে এত কাছে দেখে বিস্মিত এবং ভীতও বটে। তাই ওকে ডিসটার্ব না করে ওভারটেক করে চলে গেলাম। গাড়ি বার করে সোজা হোটেলে। সারাদিনের ক্লান্তির পর গভীর নিদ্রা!

পরদিন সকালে বেরিয়ে আমরা গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন

ন্যাশনাল পার্কের অন্যদিকে একটা ওয়াচ টাওয়ারে গেলাম। সেটা বেশ পুরাতন। ভিতরের খাড়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ক্যানিয়নের অন্যদিকের দৃশ্য খুব সুন্দরভাবে দেখা গেল। সেখানে কিছুক্ষণ থেকে এবার আমরা রওনা দিলাম কলোরাডো নদীর প্রায় উৎসমুখে যাকে 'হর্স সু বেন্ড' বলা হয়। এটা 'পেজ' নামক একটা শহরে। সেখানে রয়েছে Antelope Canyon। পথ অনেকটা, ঝুলনকে একাই চালাতে হচ্ছে। আমাদেরও চিন্তা সেটাই। ধীরেই চালাচ্ছে। মাঝে পথে থামা ও তেল ভরে কিছু খাবার নিয়ে আবার চলা। পাশে চলেছে নেভাদা পর্বতশ্রেণি। তবে এখানকার ভূমিরূপটা কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। আমরা 'পেজ'-এ পৌঁছবার আগেই সন্ধ্যা নেমে যাওয়ায় সেদিন আর অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের কাছে যাওয়া সম্ভব হল না।

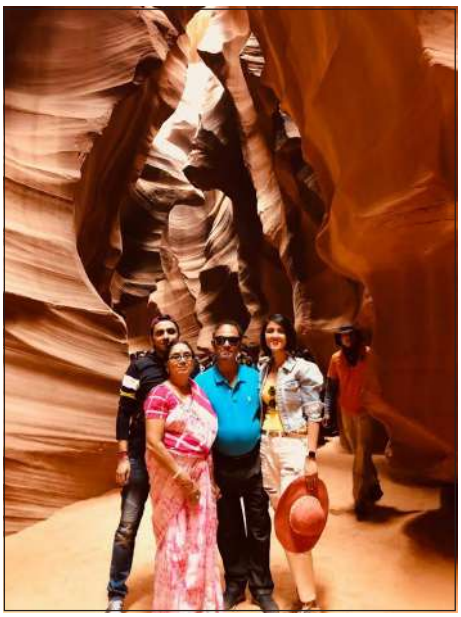

অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়নের সামনে লেখিকা

'পেজ' একটা ছোট পর্যটন নির্ভর শহর। খুবই কম জনবসতি। বছরের একটা সময় পর্যটকদের ভিড় থাকে। আমরা হোটেলে ঢুকে বিশ্রাম নিয়ে পরদিন খুব ভোরে উঠে চলে গেলাম অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ ও পর্বতের কাছে। গাড়ি থেকে নেমে বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়। ভোরবেলা বলে অসুবিধা হয়নি। একটা ছোট পাহাড়কে ঘিরে কলোরাডো নদীর বয়ে চলা। তার শান্তরূপ দেখে বোঝার উপায় নেই যে পরবর্তীতে শক্তি সঞ্চয় করে সে এমনই এক বিস্ময় হয়ে উঠবে। ভোরের আলোয় উদ্ভাসিত পর্বতমালা ও অশ্বক্ষুরাকৃতি বাঁকটি অতি দৃষ্টিনন্দন। নদীর পাশে বসে ভোরের হাওয়ায় মন সহজেই অন্তর্মুখী হয়ে গেল। যত বেলা বাড়ছে লোকের ভিড়ও বাড়ছে। আমরা এবার ফেরার পথ ধরলাম। কারণ ঘরে ফিরে, তৈরি হয়ে Antelope Canyon-এর জন্য বেরোতে হবে। আজই রাতের উড়ানে আবার ফেরার কথা।

পেজ শহর থেকে সাত মাইলের দূরত্বে অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়নের ট্যুরিস্ট অফিস। হোটেলেই ব্রেকফাস্টের সুব্যবস্থা। তাই আমরা প্রস্তুত হয়ে আটটায় বেরোলাম, অফিসে গিয়ে টিকিট সংগ্রহ করলাম। ক্যানিয়ন পর্যন্ত যেতে হয় বড় বড় জিপে করে। রুক্ষ প্রান্তরের মধ্যে রাস্তা বেশ উঁচু নিচু। গাইডকে সঙ্গী করে আমরা অ্যান্টিলোপের সামনে পৌঁছলাম। গাইড ভিতরে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। তা না হলে ভিতরের এই গোলকধাঁধায় ঢুকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের বিশাল ব্যাপ্তির তুলনায় এটি অনেক ছোট ঠিকই কিন্তু এরও সৌন্দর্য বিস্ময়কর! প্রায় একশো বছর ধরে জলপ্রবাহের শক্তিতে এর সৃষ্টি। এটি নদীর শক্তিতে নয়। বেলেপাথরে নির্মিত 'নাভাজো' পাহাড়ে হঠাৎ জলোচ্ছ্বাস ও অতিবৃষ্টির (cloud burst) কারণে সৃষ্টি হয়েছে ধীরে ধীরে। গাইড জানালেন ১৯৩৯ সালে একটি ছোট মেয়ে ভেড়া চরাতে গিয়ে এই খাতটির দেখা পায়। তখনই এটি মানুষের সামনে আসে। এর দুটো অংশ আছে, আপার ও লোয়ার। আমরা চার হাজার ফুট এই আপার অংশটাকেই ঘুরে দেখলাম এবং আবারও বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে গেল।

জানা গেল যে মাঝে মাঝেই অতিবৃষ্টিতে ভিতরে জলপ্রবাহ প্রবেশ করে। সাম্প্রতিক কালে ২০১৫ সালে হঠাৎ জলপ্লাবনে কয়েকজনের মৃত্যুও হয়েছে।

জলের শক্তিতে পাথর ক্ষয়ে যায়। রেখে যায় কিছু সুন্দর আল্পনা। কিছুটা ভাস্কর্য পাথরের গায়ে প্রকৃতিই সৃষ্টি করেছে—কোথাও মানুষের মুখ, কোথাও বা হাতি। উপরের কয়েকটি ছিদ্র থেকে রোদের আলো সোজা এসে পড়ে, তাতে সেই কারুকার্য যেন অন্য মাত্রা পায়। নির্দেশক ভদ্রলোক বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলি চিহ্নিত করে দেখাচ্ছিলেন, যা হয়তো সাধারণ পর্যটকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে।

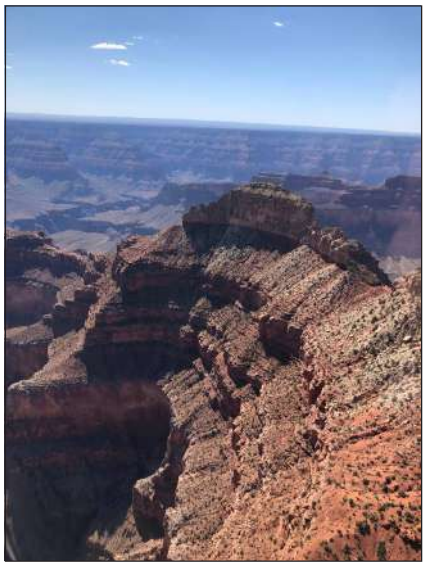

গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের একটি দৃশ্য

প্রায় দু-ঘণ্টার হাঁটাপথে পুরো গিরিখাতটি পর্যবেক্ষণ করা সম্পূর্ণ হল। ভিতরে তাপমাত্রা অনেক কম। অনেক পর্যটক থাকায় ভিতরের সংকীর্ণ জায়গা দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে দেখতে দেখতে চলেছি। ভাবছি, এই জগতে শিল্পকলার তো অন্ত নেই। মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। ঈশ্বর তাকে বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন। তার সাহায্যে সে কত কিছু নির্মাণ করে তাক লাগিয়ে দিতে পারে। দেশে বিদেশে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রকৃতিই স্বয়ং যেখানে কারিগর, সেই সৌন্দর্যের পরিমাপও সম্ভব নয় আর তেমন দ্বিতীয়টিও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সবগুলিই ইউনিক। তাই বিস্ময়ে ভ্রমি বিস্ময়ে!

আনন্দ নিয়ে আমরা এবার ফিরছি ভরা মনে। আজই ফিনিক্স পৌঁছে রাতের উড়ান ধরতে হবে, তাই তাড়াতাড়ি বেশ কিছুটা জল কিনে নিয়ে রওনা হলাম। রাস্তাতেই কিছু খেয়ে নেওয়া যাবে।

ঝুলন দক্ষ সারথি, কিন্তু এতটা পথ! তবু বললাম ধীরে চালাতে, যদিও বিমান ধরার তাড়া ছিল। কিছুদূর যাওয়ার পর বিপত্তি, অদ্ভুত যানজট। ঝুলন কার্যত কিছুটা বিশ্রাম পেলেও একটু চিন্তা তো ছিলই। প্রায় আধঘণ্টা পর রাস্তা পরিষ্কার হল। কিছুদূর এগিয়ে দেখা গেল একটা বড় ট্রাক মাঝ রাস্তায় বিকল হয়েছে। তাতেই এই যানজট। যা খুবই বিরল এদেশে। তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি এই রক্ষে!

ফিনিক্স পৌঁছে এয়ারপোর্টের পাশেই আমাদের তিনদিনের সফরসাথি গাড়িটাকে ফেরত দিয়ে আমরা এয়ারপোর্টে ঢুকলাম। এবার অভীক চলে যাবে তার কর্মস্থল ক্যালিফোর্নিয়ার উড়ান ধরতে। আমরা ফিরব পোর্টল্যান্ড। তিন দিন একসঙ্গে ঘুরলাম। দুই ভাইবোনে কত যত্ন করে আমাদের নিয়ে বেড়াল। সর্বদাই আমাদের কীসে সুবিধা হবে সেদিকে নজর। এবার তাই মনটা বিষণ্ণ হল। তবে এত সুন্দর বিস্ময়কর ভ্রমণের স্মৃতি মনে থাকবে চিরকাল। বড় অমূল্য এই প্রাপ্তি! উড়ানে বসে নৈঃশব্দ্যের মাধুরী উপভোগ করছি স্মৃতিচারণার সাথে। ভেসে আসে মনে চিরপুরাতন গান—

“কান পেতেছি, চোখ মেলেছি
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান।
বিস্ময়ে, তাই জাগে আমার গান॥”